সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

উপস্থাপক উক্ত পর্যালোচনাটি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিউনারায়ন রামেশ্বর ফতেপরিয়া মহাবিদ্যালয়ের সম্মানিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নির্ধারিত পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে পেশ করা হলো।

উপস্থাপক

আব্দুর রাইহান

6 সেমিস্টার রোল :- 3116245 নং :-2075374

রেজিস্টেসন নং:- 073174 সাল:-2020-2021

স্নাতক ষষ্ঠ সেমিস্টার

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক সৌমল্য ঘোষ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শিউনারায়ন রামেশ্বর ফতেপুরিয়া মহাবিদ্যালয়

ভূমিকা (Introduction)

- সমসাময়িক পৃথিবীতে যে কয়েকটি জটিল ও ভয়াবহ সংকটের সামনে দিশেহারা ও অসহায় হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক সমস্যাটি হল সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসবাদ আজ বিশ্বের কোনো একটি দেশে বা অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যা নয়, নতুন শতাব্দীতে সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিকীকরন সম্পূর্ন হয়েছে, এই প্রসারিত সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়ে আধুনিক বিশ্ব বিপন্ন, বিপন্ন মানব সভ্যতা। হাড় হিমকরা আতঙ্কের বাতাবরন তৈরি করে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ও গুপ্ত সঙ্ঘগুলি আঘাত হেনে চলেছে, একের পর এক দেশের জনসমাজগুলির ওপর। আধুনিক বিজ্ঞান ও উন্নততর প্রযুক্তির কৃৎকৌশলকে ব্যবহার করে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজে পারদর্শিতা অর্জন করে চলেছে দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ও সংগঠনসমূহ।

আজকের দুনিয়ায় ছোট-বোড়, উন্নত-উন্নয়নশীল, প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য; প্রাচীন-নবীন সব শ্রেণির রাষ্ট্রই কমবেশি সন্ত্রাসবাদের শিকার, সন্ত্রাসবাদ বর্তমানে কোনো জাতীয় সমস্যা নয়, এটি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং সেই কারনে এর মোকাবিলা আন্তর্জাতিকভাবেই করা উচিত।

সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন কারন (Cause of Behind Terrorism)

- সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন কারনকে দায়ী করা হয়। এগুলি নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল —

1. মনস্তাত্ত্বিক কারন : গবেষনা করে দেখা গেছে যে শিশু বয়সে মানসিক ভারসাম্যহীনতা অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়। ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ছোট শিশু যদি বাবা-মার আবেগহীন, রূঢ় আচরনের ফলে বাবা-মায়ের প্রতি রাগ বড়ো হয়ে রাষ্ট্রের প্রতি পড়ে এবং সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়।

2. মতাদর্শভিত্তিক কারন : মার্কস- লেনিন- মাও এর মতবাদে বিশ্বাসি হয়ে অনেকে মতাদর্শভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয়। ভারতের মাওবাদী ও নকশালপন্থি গোষ্ঠী পুঁজিবাদী আর্থ -সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী।

3. পরিবেশগত কারন ও হিংসাত্মক সংস্কৃতি : সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিশু যে পরিবেশে বড়ো হয়, দারিদ্র- অশিক্ষা, অপরাধমূলক কাজকর্ম, হিংসা, বিক্ষোভ, খুন প্রভৃতি ঘটনা অনবরত ঘটতে থাকলে মানুষের মনে উগ্র হিংসার জন্ম হয় এবং ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদের পথে প্ররোচিত হয়।

4. অর্থনৈতিক কারন : ধনবৈষম্য পৃথিবীর জনগনকে দু-ভাগে ভাগ করে দিয়েছে haves' ও have not', অর্থনৈতিক শোষন ও বঞ্চনার ফলে বঞ্চিত শ্রেনী সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে চরমপন্থা গ্রহন করে থাকে। রাশিয়া- ইসরায়েল, স্পেন প্রভৃতি দেশে আর্থিক বৈষম্যজনিত কারনে সন্ত্রাসবাদের গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

5. উপনিবেশবাদ : উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দুর্বল ভূ-খন্ডের মানুষ দীর্ঘদিন নির্মমভাবে শোষন করেছে। ফলে পরাধীন জনগন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হিংসার পথ গ্রহন করে এবং সন্ত্রাসবাদী হয়ে ওঠে।

6. ধর্মীয় মৌলবাদ : ইহুদি ও প্যালেস্টাইন এর দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব ইহুদি ও মুসলিম ধর্মের দ্বন্দ্ব - যা ভয়াবহ সন্ত্রাসের রূপ।

7. গেরিলা রনকৌশল অতিপ্রয়োগ : বিপ্লবী নেতৃবর্গ অতিমাত্রায় গেরিলা রনকৌশল ব্যবহার করার ফলে অনেক সময় সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়।

সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন ধরন বা প্রকারভেদ (type of Terrorism)

■ সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, পল উইলকিনসন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল

1. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ :— রাষ্ট্র এই ধরনের সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দমন করার জন্যে। কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য রাষ্ট্র এ ধরনের দমনমূলক নীতি গ্রহন করে থাকে।

2. উপ-বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাসবাদ :— এই ধরনের সন্ত্রাসবাদ বিপ্লবাত্মক উপায়ে ক্ষমতা দখলের জন্যে প্রচলিত থাকে।

3. বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ :— এই ধরনের সন্ত্রাসবাদ দূরবর্তী লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন আনার জন্য সংঘটিত হয়।

এছাড়াও আরোও কয়েক ধরনের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ পরিলক্ষিত হয়, এগুলো হল —

i. মতাদর্শগত সন্ত্রাসবাদ ii. আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদ iii. পরমানু সন্ত্রাসবাদ iv. জৈব-রাসায়নিক সন্ত্রাসবাদ v. সাইবার সন্ত্রাসবাদ vi. রাষ্ট্রদ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসবাদ vii. ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ viii. নৃতাত্ত্বিক সন্ত্রাসবাদ ix. জাতীয়তাবাদী আন্দোলনভিত্তিক সন্ত্রাসবাদ x. স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসবাদের আর্থিক উৎস (Funding of Terrorism)

■ সন্ত্রাসবাদ পরিচালনার জন্যে যে সকল উপায়ে অর্থের সংস্থান করে থাকে সেগুলি হল —

i. অস্ত্রের চোরাকারবার ii. অপহরন করে মুক্তিপন দাবি iii. মাদক চোরাচালান iv. বিভিন্ন ভুয়ো প্রকল্প প্রদর্শন করে জনগনের কাছে থেকে টাকা সংগ্রহ বা আদায় করা v. ব্যাংক ডাকাতি vi. চাঁদা আদায় vii. ভৌতিক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা viii. হুন্ডি ও মিথ্যে বরাত পাওয়া প্রভৃতি হল সন্ত্রাসবাদের আর্থিক উৎস।

তথ্যসূত্র (Reference)

(i) তত্ত্ব ধারণা ও বিষয় সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও দেবাশিস নন্দী ।

(ii) ইতিহাসের আলোয় সমকালীন বিশ্ব 1945-2008 গৌরীশংকর বন্দোপাধ্যায়,

(iii) পশ্চিমা সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে (হিরোশিমা থেকে ড্রোনযুদ্ধ) নোম চমস্কি ও আন্দ্রে ভিচেক ।

উপসংহার (Conclusion)

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রেক্ষিতে বলা যায় যে সন্ত্রাসবাদ আসলে বিশ্বব্যাপি একটি আন্তর্জাতিক ভয়ংকর রূপ বিশেষ। ক্রমশঃ এর প্রসারন অক্ষুন্ন বেড়েই চলেছে। এর দমন করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বা পদক্ষেপ অবলম্বন করলেও এর মধ্যে কিছুটা সক্রিয়তার অভাব বর্তমানে রয়ে গেছে, যা স্বীকার করতে হয়।

বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনা সকল সক্রিয়তার অভাব থাকলে দেখা যে পুরো বিশ্ব ব্যাপী সন্ত্রাসবাদ এক আগ্রাসবাদে পরিনত হবে। বিশ্ব জুড়ে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হবে এবং যা সারা বিশ্বকে গ্রাস করবে।

সুতরাং এর পর্যালোচনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ দেখা গেলেও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গেলে সর্বত্র, সর্বদা সক্রিয়তার অভাব থাকলে দমন করা সম্ভব নয়।

ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা ও ডঃ বি আর আম্বেদকর: এটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

উক্ত পর্যালোচনাটি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিউনারায়ন রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজের সান্মানিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নির্ধারিত পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে পেশ করা হল

উপস্থাপক

আবুল কালাম আজাদ

রোল - 3116245 নং- 1200012

রেজিস্ট্রেশন নং- 073176 সাল : 2020-2021

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক নরোত্তম বিশ্বাস

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ষ: 2019-2023

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	1-3
প্রথম অধ্যায়	3-6
ভীমরাও আম্বেদকর এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী	
দ্বিতীয় অধ্যায়	7-12
ভারতের জাত ব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে আম্বেদকর এর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা।	
তৃতীয় অধ্যায়	13-21
ভারতবর্ষে জাত ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে আম্বেদকর এর চিন্তা ধারা	
চতুর্থ অধ্যায়	22-25
জাত ব্যবস্থা ধ্বংস সাধনে আম্বেদকর এর চিন্তা ধারা	
পঞ্চম অধ্যায়	26-28
উপসংহার	
গ্রন্থপঞ্জি	29-31
ক: বাংলা	
খ: ইংরেজি	

৪. Arun Shourie রচিত **Worshipping False Gods** গ্রন্থে লেখক ডঃ আম্বেদকরকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিক থেকে আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন প্রমাণসহ ডঃ আম্বেদকরের সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়।

- **গবেষণার পদ্ধতি:-**

এটা মূলত গুণগত (Qualitative) গবেষণা। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে আমি **"মূল্যপাঠ্য ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি"** অনুসরণ করেছি। এই কাজের জন্য আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজন মত ভাবে ইন্টারনেটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ভীমরাও আম্বেদকর এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ভীমরাও আম্বেদকর জাতি, ধর্ম,বর্ণ,লিঙ্গের ঊর্ধ্বে এক ভারত গঠন করতে চেয়েছিলেন। আমরা যারা ১৯৫০ সালের পর জন্ম নিয়েছি তাদের কাছে ডাঃ আম্বেদকর জাতীয় সংবিধানের পিতা হিসেবে পরিচিত।

ভীমরাও আম্বেদকর ১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল ইন্দোরের নিকটবর্তী "মহো" নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। যা বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত,তিনি মহারাষ্ট্রের একটি অস্পৃশ্য জাত মাহার কাপ্টের সদস্য। তাঁর আদি গ্রাম কোঙ্কন জেঠিমা রাখার উপকূলবর্তী অংশে অবস্থিত তাকে আম্মাভাদে বলা হত। আম্বেদকর এর আসল নাম আম্বাভাদেকর যেটি আম্বাভেদ থেকে এসেছে। ১৯০০ সালে তিনি আম্বেদকরে পরিবর্তিত হন।

- তিনি শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন দেশের বাইরে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া(Colombia University)বিশ্ববিদ্যালয়ে এরপর লন্ডনের London School of Economics এবং জার্মানির **বন বিশ্ববিদ্যালয়ে** অধ্যায়ন করেন। দীর্ঘ সময় কর্মহীন থাকার পর Sydenham College তে Political Economic এ অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত হন।

সমসাময়িক সময়ে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ বিপর্যয় হোমরুল আন্দোলন এবং স্বশস্ত্র বিপ্লব ইত্যাদি কারণে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের শান্ত করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অংশ হিসাবে দায়িত্বশীল ভারত সরকার গড়ে তোলার জন্য স্ব-শাসিত সংগঠন গুলির উন্নতির কথা বলা হয়। তখনই ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার অস্পৃশ্য জাতীয় কোন সমস্যা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

কোলাপুর মহারাজের আর্থিক সহায়তায় ১৯২০ সালে তিনি একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর তিনি আবার পড়াশোনা পুনরারম্ভ করার সুযোগ পান। তিনি ইংল্যান্ডের ফিরে যান এবং ১৯২১ সালে M. SC ডিগ্রি লাভ করেন। পরের বছর The Problem of the Ruppe এই গবেষণা পত্রটি উপস্থাপিত করেন ।

তিনিনি বোম্বে ফিরে এসে আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অস্পৃশ্য জাতের সদস্য হওয়ার কারণে তাঁর পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই ঘটনার দ্বারা গভীর ভাবে আহত হয় জজা-ব্যবস্থা অভিযানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

- ১৯২৪ সালে Bahishkrit Hitakarini Sabha প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। যে সময় তিনি অস্পৃশ্যদের কুয়োর জল লাভ এবং মন্দিরে প্রবেশ করার আইন অধিকার লাভের জন্য কঠিন পরিশ্রম করেন।

১৯৩০ সাল থেকে আম্বেদকর প্রথম সরাসরি দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটিশদের কাছে অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গড়ে তোলার কথা বলেন। এছাড়াও অস্পৃশ্যদের একটি পৃথক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে তার এই চাওয়া বাস্তবিক হলে হিন্দুদের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে গান্ধীজী পুনের Yerada জেলে অনশন শুরু করেন। গান্ধীজীর এই পদক্ষেপ আম্বেদকরকে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী পরিত্যাগ করে ১৯৩২ সালে পুনা চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে।

১৯৩৬ সালে আম্বেদকর প্রথম তাঁর রাজনৈতিক দল Independent Labour Party গঠন করেন। এরপর ১৯৪২ সালে তিনি শ্রমমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালেই তিনি Schedule Caste Federation নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালের ৩ রা আগস্ট জওহরলাল নেহেরু তাঁকে আইন মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। এরপর ২৯ শে আগস্ট সংবিধানের ড্রাফটিং কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৭-৫০ এই সময় তিনি পুরোপুরি সংবিধান রচনায় কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৫০ সালে Mahabodhi Socity পত্রিকার The Buddha and Feature of His Religion শিরোনামে একটি পেপার লেখেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কলম্বো যান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ধর্মের রীতিনীতি নিয়ে অধ্যায়ন করেন। তিনি ১৯৫৫ সালের রেঙ্গুন World Buddhist Conference এ যোগদান করেন।

- ১৯৫৬ সালে ১৪ই অক্টোবর তাঁর লক্ষাধিক অনুগামীদের সঙ্গে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ওই বছরই ৩০শে অক্টোবর দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৬ই ডিসেম্বরের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি পর আমরা প্রথম যা নিয়ে আলোচনা করব তা হল সাধারণভাবে ভারতে জাত ব্যবস্থার উদ্ভবের একটি আত্মিক পর্যালোচনা। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভারতের জাত ব্যবস্থার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করব এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের জাতব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকরের ধারণাগুলি আলোচনা করব।

মূল্যায়ন

সামাজিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এইবার ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের ধারণার একটি মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করব। ডঃ আম্বেদকরের অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে অস্পৃশ্যতার উৎপত্তির প্রধান কারণ হিসেবে তিনি বলেন আদিম সমাজের দলছুট মানুষরা যারা গ্রামের বাইরে বাস করত তারা পরবর্তীকালে অস্পৃশ্য বলে পরিচিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ- অস্পৃশ্যতার উৎপত্তির জন্য একটি কারণ হিসেবে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পারস্পরিক ঘৃণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত:- চতুর্থ অধ্যায় জাত ব্যবস্থার প্রভাব বর্ণনার সময় তিনি বলেন শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে জাত ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলেও তা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কারণ একজন মুসলমান বা শিখকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তর সন্তোষজনক। কারণ সেই ব্যক্তির জাত কি তা জানার আগ্রহ মানুষের থাকে না। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

চতুর্থত:- ডঃ আম্বেদকর যখন সামাজিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অস্পৃশ্যতার চেষ্টা করেছিলেন সে সময় মন্দির,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি জায়গায় তপশিলী জাতি, উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া জাতগুলোর প্রবেশিকা লাভের জন্য লড়াই করতে পারেন। কারণ এটা ছিল ব্রাহ্মণ্যকারী সমাজের জাতি আক্রমণ।

- তিনি যখন দেখেন জাতের প্রাসাদ কে ভাঙ্গার জন্য হিন্দুত্বকে আক্রমণ করা প্রয়োজন সে সময় তিনি বিকল্প হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলেন। কারণ এই ধর্ম তার কাছে একটি রাজনৈতিক বিকল্প ছিল, কিন্তু কৌশলগত কারণ তিনি একটাকে ধর্ম হিসাবে ব্যবহার করেন।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি ডঃ আম্বেদকর অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে চিন্তা নিঃসন্দেহে একটি মুক্ত নয় এবং বিতর্কের ঊর্ধে নয়। আম্বেদকরের চিন্তার বেশ কিছু অংশ ইতিহাস নির্ভর থেকে অনেক বেশি যুক্তি নির্ভর এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত কিন্তু সে উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এক লক্ষ্যকে পরিপূর্ণ করার। ভারতের নীরব ও পদদলিত অস্পৃশ্যদের তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। বলাবাহুল্য এই উদ্দেশ্য তিনি বহুলাংশে সফল এবং দলিত নিষ্পেষণ প্রতিরোধ এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে দলিতদের সাংবিধানিক অধিকার স্বীকৃতি লাভের ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা:-

- আম্বেদকর বি.আর ১৯৯৫ (ক), "ভারতের বর্ণ ব্যবস্থা", আম্বেদকর রচনা সম্ভার, প্রথম খন্ড, নতুন দিল্লিতে,ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, পৃঃ ২১-৩৭
- আম্বেদকর,বি.আর, ১৯৯৫ (খ), " ডঃ বি.আর আম্বেদকর কর্তৃক প্রস্তুত ভাষন",আম্বেদকর রচনা সম্ভার, প্রথম খন্ড, নতুন দিল্লী,ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার,পৃঃ ৫৫-১০৩
- আম্বেদকর,বি. আর ১৯৯৭ " হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা এর অত্যাবশ্যক নীতিসমূহ", আম্বেদকর রচনা সম্ভার, ষষ্ঠ খন্ড, নতুন দিল্লী,ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, পৃঃ ১১৩-১৩৪
- আম্বেদকর,বি.আর, ১৯৯৯ (ক), "অ-হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা", আম্বেদকর রচনা সম্ভার, চর্তুদশ খন্ড, নতুন দিল্লী,ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, পৃঃ ৩১-৩৮

- আম্বেদকর,বি.আর,"অস্পৃশ্যতার মূল হিসাবে বৌদ্ধদের প্রতি ঘৃণা", আম্বেদকর রচনা সম্ভার, চর্তুদশ খন্ড, নতুন দিল্লী,ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, পৃঃ ৩৯-৫৫ ।
- আম্বেদকর,বি.আর, ১৯৯৯ (ঝ), "অচ্ছুৎদের গুরুত্ব", আম্বেদকর রচনা সম্ভার, ভারত সরকার, পৃঃ ২১-২২
- আম্বেদকর,বি.আর, "অস্পৃশ্যতার মূল হিসাবে বৌদ্ধদের প্রতি ঘৃণা", আম্বেদকর রচনা সম্ভার, চর্তুদশ খন্ড, নতুন দিল্লী,ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, পৃঃ ১০৩-১১১

English:-

- Ambedkar, B. R. 2014, " Annihilation of Cast" in Valerian Rodriguez (Eds) 2014, The Essential writings of B.R. Ambedkar, New Delhi, Oxford University Press.
- Dutt, N. K. 1968, Origin and Growth of Cast in India, Vol-1, Calcutta, Sarat Press Limited.
- Jaffrelot, C. 2008, Dr, Ambedkar and Untouchability, New Delhi, Permanent Black.
- Keer, D. 1991, Dr.Ambedkar Life and Mission, Mumbai, Popular Prakashan Pvt. Ltd.
- Sharma, U. 2005, Caste, New Delhi, Viva Books Pvt. Ltd.
- Llaiah, K. 1999,"Towards the Digitization of the Nation ", In Partha Chatterjee (Eds) 1999, wages of freedom, New Delhi, Oxford University Press.

UNIVERSITY OF KALYANI

SRF COLLEGE

SESSION-2020-2021

শিক্ষীকার নাম -নার্গিস তানজিমা

বিষয়- রাষ্ট্রবিজ্ঞান

গবেষণা পত্র

TOPIC-"ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, সমস্যা ও তার সমাধান"।

নাম- আবুল কালাম সেখ

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার - 073177

ক্লাস- B.A 6th SEMESTER (HONOURS)

রোল-3116245 নং-2075381

Abul k alam sk

STUDENT SIGNATURE

TEACHER SIGNATURE

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়:-	ভূমিকা	04
	গবেষণা উদ্দেশ্য গবেষণার সমস্যা	05
	গবেষণার প্রশ্নাবলী গবেষণার পদ্ধতি	06
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভারত-বাংলাদেশের অতীত সম্পর্ক	07-08
তৃতীয় অধ্যায় :-	ভারত-বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট	09-11
চতুর্থ অধ্যায়:-	ভারত-বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	12-13
পঞ্চম অধ্যায়:-	ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা।	14
	ভারত-বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান	15
	মূল্যায়ন	16
	গ্রন্থ পঞ্জিকা	17

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা:-

ভারত ও বাংলাদেশ হল দক্ষিণ এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী দেশ ।বাংলাদেশ একটা বাঙালি জাতীয়তাবাদী জাতি রাষ্ট্র হলেও ভারত বিভিন্ন জাতি সমষ্টিগত দেশ। 1971 সালে পাকিস্তান বিরোধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় বাঙালির সম্প্রদায় ও ভারত সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে তার প্রতিবেশী ভারতের সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭১ সালে ৬ ডিসেম্বর ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের মধ্যে দিয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও আদর্শিক নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে সেই সম্পর্ক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছায় ।ভারত ও বাংলাদেশ এর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে গভীর কৌতূহল ও আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। প্রতিবেশী দুই দেশের সম্পর্কের গভীরতা ও জটিলতা যেন তার সমস্ত অবময় নিয়ে জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে ।এ কথা বললে ভুল হবেনা ,যেন দুই দেশের মানুষের ইতিহাস, ভূগোল ,ভাবাবেগ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতির এক নিবিড় সমন্বয় দুই দেশের সম্পর্ককে বিশেষত্ব দান করেছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রায়সই ঝড় তোললেও দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে বাংলাদেশ যেন চলমান ইতিহাসে কখনো কখনো একটি পদ টিকা আবার কখনো কখনো সাময়িক বিরস্মমাত্রা। সরকারি যোগাযোগ ,আদান প্রদানে ,আগ্রহ বজায় থাকলেও জনগণের মনে দুই দেশের সম্পর্ক যেন অচেনা পদের ঠিকানা, আবার কখনো কখনো মনে হয় আমরা বিপরীত গন্তব্যে যাত্রী।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক সফরের পর ভারতের প্রতি বাংলাদেশের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা গেছে সে কথা বলা কঠিন। কোন ভারতীয় এটাকে ভারত বিরোধী প্রচারণার ফল বলে মনে করে ,আবার অনেকে মনে করেন এটা বাংলাদেশের বিভাজিত রাজনীতির অবদান, আবার অনেকে এতে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের গন্ধও আবিষ্কার করেছে ।অনেক বাংলাদেশি বিশ্লেষকও বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোহভাবে একে ই ধরণের উপাদান খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছে ।তবে এইসব বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষনের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো এইসব ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের জন্য একটা ইতিবাচক রোড ম্যাপ তৈরি করা।

ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে আবেগ বা আদর্শিক অবস্থানের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষণীয়। কখনো কখনো তা ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়কে ঘিরে আবার কখনো কখনো তা ব্যক্তিগত সম্পর্ক কে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। দুই দিক থেকে এমন প্রবণতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে প্রভাবিত করে চলেছে ।এর অর্থ এই নয় যে প্রয়োগিক উপযোগিতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন অবদান রাখেনি তা নয়। তবে যে পরিমাণে ক্রিয়াশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল তা হয়নি সেটা বলা চলে এর ফলে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক এক ধরনের ভারসাম্যহীন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তবে সাম্প্রতিককালে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ধীরে ধীরে উন্নত পর্যায়ে অগ্রসর হচ্ছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ ও ভারত হলো দক্ষিণ এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী দেশ উভয় দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের জন্ম ভারতের হাত ধরেই। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ভারত ও বাংলাদেশের অতীত সম্পর্ক ,বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন হবে তা আলোচনা করা এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা এবং সেই সমস্যাগুলি কে অতিক্রমণ করে কিভাবে উভয় দেশ পারস্পারিক সম্পর্ক বজায় রাখবে সেটা আলোচনা করা।

গবেষণার সমস্যা

এই গবেষণা নিম্নক্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

1. ভারত হলো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বর্তমান। অতীতে দীর্ঘকাল সময় ধরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে এই সম্পর্ক কখনো ভালো আবার কখনো খারাপ এইভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের এই সম্পর্ক কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অনুমান করা যেতে পারে।

2. একবিংশ শতাব্দীর নানা ঘটনা ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

গবেষণার প্রশ্নাবলী

আমার এই গবেষণার পত্রটির প্রশ্ন নিচে আলোচনা করা হলো

1. ভারত ও বাংলাদেশের অতীত সম্পর্ক কেমন ছিল ?
2. ভারত ও বাংলাদেশে সম্পর্কে সাম্প্রতিক অগ্রগতি কেমন?
3. ভারত ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন হতে পারে ?
4. দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা?
5. ভারত ও বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানপথ কেমন হতে পারে?

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত বিশ্লেষণধর্মী। তবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে এই গবেষণার কাজে লাগানো হয়েছে। এটি মূলত গুণগত তথ্যের উপর নির্ভর করে করা হয়েছে দ্বিতীয় স্তরের উৎসসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে যেমন গ্রন্থপঞ্জিকা, সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেল ইত্যাদি গবেষণার জন্য গুগল এর সাহায্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে ভারতের কাছ থেকে অবজ্ঞার অবগুন্ঠন থেকে বেরিয়ে এসে অনেকটা আবেগ নিয়েই ভারতের প্রতি এক ধরনের গেইম changing চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে ।দক্ষিণ এশিয়ায় পাক- ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্কের বাইরে একটি নতুন সম্পর্ক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আগ্রহী ভূমিকা নিয়েছে। ভারতকে বাংলাদেশ সেই অবস্থানের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে । ভারত বলছে , তারা বাংলাদেশকে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য সম্পর্কে নতুন মডেল তৈরি করতে চাই। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের প্রতি ভারতের কি সেই পরিমাণ মনোযোগ আছে ? নাকি তারা বাংলাদেশকে তাদের আঞ্চলিক কৌশলগত লক্ষ্যের পথে একটি অংশীদার হিসেবে মনে করেন? গত কয়েক মাসে ভারতের অনেক বিশেষজ্ঞ এই নিরিখে ভারতে দক্ষিণ এশিয়ার নীতি কে মূল্যায়ন করেছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেন দক্ষিণ এশিয়া ভারতের পররাষ্ট্র নীতিতে কতটুকু প্রাধান্য বিষয় ,যা ভারতের আঞ্চলিক কৌশলগত লক্ষ্যের জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাশা ভারত গভীরভাবে এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাববে ।সহজ কথায় বলা যায় ,বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ার জন্য নতুন সম্পর্কের ভিত গড়ে দিতে পারে যদি তা সৃজনশীল ভবিষ্যৎমুখী ভাবনা ও নীতি কাঠামোর মধ্যে দিয়ে চলে।

গ্রন্থপঞ্জিকা

1. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক=প্রণব কুমার দালাল

2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক= প্রাণ গোবিন্দ দাস

3. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক=মুখোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়

4. Google থেকে তথ্য নেওয়া

5. ওইকোপিডিয়া থেকে কিছু তথ্য নেওয়া

6. YouTube থেকে কিছু তথ্য নেওয়া

7. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক= ডক্টর:প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

8. ইন্ডিয়ান পলিটি এন্ড ইন্টারন্যাশনাল পলিটি=

   1. ডক্টর: বান্টি কুমার

   2. ডক্টর : হারদেশ কুমার

9. Chat GPT

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা: একটি মূল্যায়ন

উক্ত পর্যালোচনাটি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিউনারায়ন রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজের সাম্মানিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নির্ধারিত পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে পেশ করা হল

উপস্থাপক

আব্দুর রহিম

রোল - 3110245 নং- 1200774

রেজিস্ট্রেশন নং- 073173 সাল : 2020-2021

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মোহাম্মদ রবিউল আলম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ষ: 2019-2023

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
● মুখবন্ধ	1
● ভূমিকা	6
□ গবেষণা কেন্দ্রিক অনুমান	2
□ গবেষণা মূলক প্রশ্নাবলি	3.
□ গবেষণার উদ্দেশ্য	4.
□ গবেষণা প্রদ্ধতি	5.
● প্রথম অধ্যায়	
□ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা	7.
□ চারস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা	8.
□ ইতিহাস	13.
□ দ্বিতীয় প্রজন্ম (1977- বর্তমানকাল)	14.
□ গঠন	15
□	
● দ্বিতীয় অধ্যায়	
□ কার্যাবলি	19
□ গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা	20
□ পঞ্চায়েত প্রশাসন	21.
□ তহবিল ও সম্পত্তি	21.
● তৃতীয় অধ্যায়	
□ মূল্যায়ন	22
□ তথ্য সূত্র	23

প্রথম অধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি পঞ্চায়েত শব্দটির ব্যুৎপত্তি হিন্দি থেকে, প্রাচীন ভারতে পাঁচজন সদস্য নিয়ে যে স্বায়ত্ত স্বনির্ভর গ্রামীণ পরিষদ গঠিত হত; তাকেই বলা হত পঞ্চায়েত, আধুনিক কালে এই শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয় এক সমষ্টিগত চেতনা, পঞ্চায়েত শব্দটির লোক প্রচলিত অর্থ হয়ে দাঁড়ায় পাঁচজনের জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃত পাওয়ার পর বর্তমান গ্রাম বাংলাকে কেন্দ্র করে যে প্রশাসনিক জনকল্যাণ মূলক বিচার বিভাগীয় ও প্রতিনিধিত্ব মূলক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পশ্চিম বঙ্গের প্রচলিত তাকেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়, 1870 সালে প্রথম গ্রাম চৌকিদার আইনের মাধ্যমে আধুনিক গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ভারতে এই ব্যবস্থা তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন বিধি পাশ হয় ও সংবিধান সংশোধন করা হয়। 1957 সালে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন বিধিবদ্ধ হয়। 1957-1963 সালের আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে চারস্তর পঞ্চায়েত চালু হয়।

এরপর 1973 সালে নতুন আইনের মাধ্যমে চালু হয় ত্রি স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। 1993 সালে ভারতীয় সংবিধানের 73 তম সংশোধনী অনুসারে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং 1992 সালে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইনটিকেও পুনরায় সংশোধিত করা হয়।

● চারস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

i) গ্রাম পঞ্চায়েত :- এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা তিন থেকে 15 এরা সকলেই এলাকার ভোটদাতাদের দ্বারা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। নির্বাচিত সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন প্রধান এবং একজন উপ প্রধানকে নির্বাচন করতেন। সরকার মনোনীত সদস্যরা অবশ্য এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। প্রধান বা উপপ্রধান দপ্তরের মেয়াদ তিন চারবছর। গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের গৃহীত প্রস্তাবনে এদের অপসারিত করা যেত। প্রধানই তিনেন পঞ্চায়েতের মুখ্য কর্মনির্বাহী। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সকল দিকেই তাকে নজর রাখতে হতো। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় তাকেই সভাপতিত্ব করতে হতো।

☑ গ্রাম পঞ্চায়েত এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে গ্রাম সভা গঠিত হত। গ্রাম সভার বৈঠক বছরে দুই বার। অধ্যক্ষ এই বৈঠক গুলিতে সভাপতিত্ব করতেন। আর্থিক বাৎসরিক বৈঠকে পরবর্তি বজরের ব্যয় বরাদ্দ ও পূর্ব বর্তী বজরের কাজের প্রতিবেদন বিবেচনা করা হত। গ্রাম সভা গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ছিল তিন ধরণের বাধ্যতা মূলক, অর্পিত ও ঐচ্ছিক। মূলত দৈনন্দিন সংক্রান্ত কাজগুলি ছিল বাধ্যতামূলক কাজ, উন্নয়ন ও পরিপূরক গঠন সংক্রান্ত কাজগুলি ছিল অর্পিত ও সেবচ্ছাধীন। অধ্যক্ষ কেই সব দায় দায়িত্ব বহন করতে হত।

ii) <u>অঞ্চল পঞ্চায়েত</u> :- অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হত কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে। মূল আইন বলে এই পঞ্চায়েতে সদস্যগণ গ্রামসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হত। পরবর্তীকালে দুই প্রকার সদস্য নিয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠিত হতে থাকে। — (i) অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষগণ। (ii) গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি প্রথম বৈঠকে একজন প্রধান ও উপপ্রধানের দপ্তরের মেয়াদ কাল ছিল চার বজর। এছাড়াও অঞ্চল পঞ্চায়েতে একজন সচীব থাকতেন।

যিনি প্রধানকে পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন ও সহায়তা করতেন। আর থাকদের কয়েকজন চৌকিদার ও দফাদার। অঞ্চল পঞ্চায়েত মূলত এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। এজন্য দফাদার ও চৌকিদারকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অঞ্চল পঞ্চায়েতের হাতেই অর্পন করা হয়েছিল। এছাড়াও ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন, কর ধার্য ও সংগ্রহ করা ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্যতম কাজ ছিল অঞ্চল পঞ্চায়েতের আয়ের মূল উৎস ছিল কর, অভিকর ও মাশুল। এছাড়া এরা কিছু সরকারি অনুদান পেত। তবে অঞ্চল পঞ্চায়েতের আয় এতই কম ছিল যে নিজেদের ব্যয় বহনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতকে উন্নয়ন কাজের অনুদান হিসাবে দেবার মতো খুব কম টাকাই তাদের হাতে থাকতো।

iii) <u>আঞ্চলিক পরিষদ</u> :- প্রত্যেকটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এলাকায় একটি করে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত কোনও সদস্য ছিল না। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এই পরিষদ পদাধিকার বলে সদস্য প্রধান সহ মোটা সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হত। স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার হতেন সহযোগী সদস্য। অন্যান্যরা ছিলেন — i) সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধানগণ। ii) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত

অধ্যক্ষদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষ। (iii) এলাকা থেকে নির্বাচিত অথচ মন্ত্রী নন এমন সাংসদ ও বিধায়ক এবং এলাকায় বসবাস করে অথচ মন্ত্রী নন এমন রাজ্য সভা ও বিধান পরিষদের সদস্য। (iv) রাজ্য সরকার মনোনীত দুজন মহিলা এবং দুজন অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্য। (v) আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত দুজন সমাজসেবী ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আঞ্চলিক পরিষদগুলিতে একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি পরিষদ সদস্যদের দ্বারা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। মহকুমা বিডিও পদাধিকার বলে পরিষদের প্রধান কার্যালয় ছিল প্রধানত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ মূলক। কিন্তু কৃষি, সমবায়দান সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য ও অপরাপর কিছু জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প গ্রহণ ও আর্থ সাহায্য দান ক্ষমতা পরিষদ গুলিকে দেওয়া হয়েছিল। নিজস্ব আয়ের সুত্র থাকলেও কোনও আঞ্চলিক পরিষদই সেগুলি ব্যবহার করত না। ফলে এই পরিষদগুলি রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদের অনুদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

iv) <u>জেলা পরিষদ</u> :- পূর্বতন জেলা বোর্ড বাতিল করে গঠিত হয় জেলা পরিষদ। একমাত্র কোচবিহার জেলায় কোনো জেলা বোর্ড না থাকায় সেখানে নতুন করে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। এই জেলা পরিষদ সদস্য ও সহযোগী সদস্য নিয়ে চার বছরের জন্য গঠিত হত। সহযোগী সদস্যদের মধ্যে থাকতেন মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক প্রমুখ সরকারি

প্রশাসক ও কর্মচারী আর সদস্যের মধ্যে থাকতেন — ① আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ। ② প্রত্যেক মহকুমা থেকে অধ্যক্ষদের দ্বারা নির্বাচিত দুজন সদস্য। ③ জেলার বসবাসকারী অথবা জেলা থেকে নির্বাচিত অথচ মনোনীত এমন সাংসদ ও বিধায়ক। ④ সরকার মনোনীত পুরসভা বা পৌরসংস্থার চেয়ার ম্যান বা মেয়র। ⑤ জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি এবং ⑥ সরকার মনোনীত অধিকিক দু-জন মহিলা। জেলা পরিষদের প্রথম সভায় একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস - চেয়ার ম্যানকে নির্বাচিত করা হত। চেয়ার ম্যানের উপর ন্যস্ত থাকতো আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার দায়িত্ব।

চারস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের মূল দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত থাকলেও সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দুর্বলই থেকে যায় এদের কাজকর্ম অবহেলিত হতে থাকে। 1959-1963 সালের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে। 1967 সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেসব প্রকল্প প্রত্যাহার করে নেন। এই উদ্দেশ্য 1973 সালে পাশ হয় পশ্চিমবঙ্গ আইন বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্ট।

ইতিহাস

প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল পাঁচ জন নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েত। এই প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত ছিল গ্রামসুলির প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব। মুঘল আমল পর্যন্ত ভারতের গ্রামসুলি এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাটি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের এই সুমহান ঐতিহ্যশালী শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। তার বদলে ভারতের রাজশক্তি নিজ কায়েমি স্বার্থ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ভারতের গ্রাম ও নগরাঞ্চলে ব্রিটিশ ধাচের এক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। আধুনিক 'পঞ্চায়েতি রাজ' শাসন ব্যবস্থা মহাত্মাগান্ধীর মস্তিষ্ক প্রসূত এক ধারণা তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠুক গ্রামকে কেন্দ্র করে। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকালে ~~1999~~ (1977 - বর্তমান) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের উক্তিটি পরি ধানযোগ্য ... 'যদি পঞ্চায়েত ব্যর্থ হয়, সিপি-আই (এম)-এর পরিকল্পনীরিক্ষা ব্যর্থ হবে।'

তৃতীয় অধ্যায়
মূল্যায়ন

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নিজেরাই নিজেদের শাসন ব্যবস্থায় যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেই উদ্দেশ্য কতটা রূপায়িত হয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নানা প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে এর সমালোচনা করেছেন।

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর ব্যাপক সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্ষেত্রে এদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন করেছে।

১) রাজ্য সরকার যে কোনো সময় যে কোনো নির্দেশ দিলে ওই সব প্রতিষ্ঠান তা পালন করতে বাধ্য থাকবে।

২) যে কোনো পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সরকারি অনুদান হ্রাস বা বন্ধ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের রয়েছে।

৩) কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত নিয়মিতভাবে হিসেব পত্র পেশ করতে পারছে না বলেও অনেকের অভিযোগ।

অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দলিয় স্বার্থে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান গুলিকে ব্যবহৃত হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

তথ্যসূত্র

i) পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত অমিত কুমার বসু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি কলকাতা 1998.

ii) ভারতীয় প্রশাসন শিউলি সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলকাতা 2005.

iii) ভারত সরকারী প্রশাসন, পদ্মারামচন্দ্র বাংলা অনুবাদ, সন্তোষকুমার অধিকার ন্যাশনাল।

iv) বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি 2001.

v) জন প্রশাসন রাজশ্রী বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলকাতা 2005.

i) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা মানবেন্দ্র নাথ রায়।